হানাবাড়ির কারখানা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Table of Contents

ফুল-বউ

ঊনপঞ্চাশ মহল নিয়ে দুপুলিয়ার সাবেকি আমলের রাজবাড়ি-এখন হয়েছে সেটা হানাবাড়ি । এই দুপুলিয়ার রাজবাড়ির দুমুখে ছিল দুটো পুল । তার এক পুল দিয়ে ঢুকত বিয়ের বরাত, আর এক পুল দিয়ে বার হতো মড়ার-খাট-এই ছিল দস্তর । পাটরানী থেকে ফুলবউ, এর মাঝে অগুনতি বাঁদী, এক-এক রাজার বিয়েতে যৌতুক করা-ঊনপঞ্চাশ মহলা বাড়িতে কৌতুকে থাকত ধরা । কোন রানী মলে কে নেবে তার স্থান, এই নিয়ে চলতো তাদের মধ্যে আড়াআড়ি । জলটুঙি, হামাম, কাচমহল, খাসমহল, রানিমহল এতো ছিলই, তার উপরে কোঠার পর কোঠা, কুঠরির পরে কুঠরী,ঘরের পর ঘর –সব ঘরের খবর নির্ণয় করতে হারি, এত বড়ো সে দুপুলিয়া রাজবাড়ি । সে সংসারে যে একবার ঢুকলে সেই বুঝলো যন্ত্রনা নেই বেঁচে থাকার তুল্য । জানের মূল্য নিয়ে তাই কেউ করতো না বাড়াবাড়ি । কুল-কিনারা পাওয়া যেত না এত বড় ফুল বাগান,তারি মধ্যে শ্বেত পাথরের বাঁধানো ফুলটুঙি ঘর-তিন দিকে তার ফুলের কেয়ারি, একদিকে সান্ নদী-একবেলা লাগে দিতে পাড়ি । উড়ো ভাষায় শোনা যায়-এই ফুলটুঙির বাগিচায় এলো একদিন রানির সাজে কোন এক ফুলমালির মেয়ে দোল-পূর্নিমায়, এক হাতে রাজার হাত, আর এক হাতে পিচকারী ।মধুরাত পূর্নিমার, ঘড়ি পড়লো একটার-হয়ে গেলো সুনসান রাজবাড়ি বাগান । সকালে দেখা গেল ফুলমালির মেয়ে কোথা ভেসে গেছে সান নদী বেয়ে, ফুলটুঙি ঘরে ফুলের বাসর রেখে খালি ! হুকুম হল রাজার-ফুলটুঙি মহল ধোলাই করবার-ধারা দিয়ে পড়লো নালি বহে আবীর কুমকুম কেশরের লালি । শ্বেত পাথরের টালি যেমন সাদা ছিল তেমনি হল, শুধু লেগে রইল পাথরের তক্তে যেন লোহার কষের মত,শক্ত চাপ রক্তের মতো রাঙা দাগ একটা দাঁড়ি । ওঠানো গেল না ঘষে সেটা জল বালি । মস্ত রাজবাড়ির মস্ত কারখানা,তার মধ্যে কে করে ঠিকানা-দাগটা রেখে গেল কিনা যাবার কালে ফুলওয়ালী ! বাদ এক বছর । দুপুলিয়াতে দেয়ালি রাতে আকাশ পাঠালো ঝড় জলের ঝাপটা; দশটা কি এগারোটা কে করে ঠিক হওয়া কাঁদছে, যেন প্যাঁচার খপ্পরে চেঁচাচ্ছে শালিক ! হয়ে ত্রস্ত, রাজারে খবর দিল নফর-অন্দরের দোরে কড়া নাড়ছেন এক কাপালিক-হাতে একখানা কাস্তে মস্ত ! হুকুম হলো ফুলটুঙি ঘরে কাপালিককে বাসা দিতে । বসবে ভৈরবী চক্কর-বুঝে নিল নফর রাজার একটু ইঙ্গিতে । সেদিন ফুলটুঙি ঘরে রাত দুই প্রহরে বাঘাসনও পড়লো রাজাসনও পড়লো দুই জনার । হুকুম নাই চাকর নফর কারো ঢোকবার,কি চৌকিদার কি চোপদার । বাহিরে ঝড় ঝাপটার মাতন ফুলবাগান দলে ফুলটুঙিতে । ভিতরে ফিরছে ঘন ঘন কাড়ন মরা মানুষের মাথার খুলিতে । ঝড়ের গর্জনে মিলছে থেকে থেকে অট্টহাস । ঝনঝন দুলছে ঝাড়, পর্দা উড়ছে এপাশ-ওপাশ । শব্দে হচ্ছে, যেন নৃত্য করছে দুটো পিশাচ । রাজার খাস কামরার আলো জ্বলছে নিভছে, দেখা যায় ঘুলঘুলিতে । ক্রমে দেয়ালির রাত হল অবসান-ভোরের আলোতে অস্পষ্ট প্রতীয়মান ফুলটুঙির ভাঙা ফুলবাগান । ফুলটুঙি ঘরে জাগাতে গিয়ে রাজারে, দেখে গিয়া ভোর বেলাতে নফরে-না কাপালিক, না রাজা কেউ বর্তমান ! ঘরটায় ভর্তি পোড়া মাংস আর তাজা রক্তের ঝাঁজা গন্ধ । সে পায়ে পায়ে পিছিয়ে দোর করে দিল বন্ধ । মহল ধোলাই করিয়ে ভৈরব দেয়ান নীরব থাকতে হুকুম দিলেন বাগেয়ানকে শপথ দিয়ে শক্ত । হাত ফেরালো ফুল বৌয়ের যাবার পর দুপুলিয়ার রাজতক্ত । কেউ বললে, রাজাটা ছিল মহাপাপী, কেউ বললে ছিল মহাভক্ত ।

আঁধার কোটা

কাচমহল, খাসমহল, বিবিমহল, মালাঘর, তারপরে গড়বন্দী আঁধার কোটা খাজনা ঘর । মোহনার সেখানে বসে দুপুর রাতে দুপুলিয়ার খাস তহবিলের হিসেব রাখে ঘড়া উল্টে ঢেলে মোহর- এক হাতে দাঁড়িপাল্লা, আর এক হাতে মাল্লাদের জল সেঁচা ডোঙার মতো চৌকোনা গাম্ভার কাঠের পাত্তর । এমন মোটা দেয়াল, ভারি দরোজা খাজনা-খানার যে ঝনঝন টাকা ঢাললে শব্দ পৌঁছায় না বাহিরে তার । সেখানে সাবধানে ওজন করছেন রাজার প্রয়োজনের নিজ খরচি । খাস-মোহরার যেন একটা বুড়ো যক্ষি-পিপুমের আলো পড়েছে টাক মাথার উপর; ভিতর হতে দুয়োর বন্ধ, কোমরে ঝুলছে চাবি শিকলি তার- বাহিরের কারো উপায় নাই হঠাৎ প্রবেশ করবার । কী করে সেখানে সিঁদ-কাঠি, কি করে শাবল ! খাজনা ঘরের পারে গন্না-কাটার মাঠ । তার একধারে খাড়া সামনা-সামনি দুটো ফাঁসিকাঠ-তাতে ঝুলছে একটা মড়া-কে জানে কোন কালে ফাঁসিতে চড়া- শুকিয়ে ফেলেছে সেটারে কত দিনের হিম জল রোদ । দুলছে সেটা আজ করছে যেন বোধ প্রাণ পেয়ে গেছে অকস্মাৎ । তারি শিয়রে রাত দুপুরের ঝড়ে পড়েছে নজরে গ্রহনে খাওয়া খানিকটা চাঁদ । এত ঝড়ে বার হয় না কুকুর শেয়াল-ফাঁসি কাঠের তলে জুটেছে বেঘোরে কালো মূর্তি চার । এ ওরে বলছে-কে আছ রে জোয়ান-ভেঙে আনো দেখি কবজী সইতে মরা মানুষের হাতের মুটখান ! আঁধার ঘুট-ঘুট, কে উঠবি উঠ, ফাঁসি-কাষ্ঠে কে আছিস সেয়ান ! ধর গন্না-কাটা নাপিতের দাড়ি কামান আস্তরি-কেটে আন মড়ার মাথার পাঁচ গাছা চুলি । দেখে না যেন ভুতের দেয়ান । পালোয়ান কে-...কে আছিস ধর না চেপে মড়াটার উল্টো পা দু খান । হয়েছে; হয়েছে যা চাই হাত হয়েছে । আরে মড়ার বেস্মতালুটা কোন দিকে রয়েছে ! ওরে টিকি থাকে যেদিকে । নে চটপট ঘুরে দে টান । রাত হচ্ছে ফিকে, চোরের মায়ের ঘরের দিকে কাজ সেরে দে পিট্টান । চোরের মা থাকে সান নদীর বাঁকে, বুড়ীর বয়েসের গাছ পাথরের হিসাব ধরে কে ! তবক্ষুর মতো কোটর-গত চক্ষু দুটো তার, নাকটা যেন সাতকেলে কাল পেঁচার । উনুন-মুখী উকুন বাছতে আছে একটা রামছাগলার-কোলের পরে রেখে । তারে দেখে মনে হয় ছাগলীর মা বুড়ী ছাগলের সিং এ মারে সে ঘামাচি ফুসকুড়ি । কেউ তারে বলে ডাইনি বুড়ী, যক্ষি বুড়ী, খায় শেয়ালের নাড়ি-ভুঁড়ি । কাল পেঁচি আর দাঁড়-কাগের জুড়িদার সে বসে আছে কম্বল মুড়ি । চোখের তারা তার কালো বেড়ালটা, দিষ্টি দিয়ে রাতে জ্বলে । সে খায় ইঁদুর ভাজা ধরে খাঁচা কলে । চোরেরা সবাই তারে উল্টো মা বলে । সে যদি পড়ে দেয় উল্টো মন্তর ভিতরের আগড়ে-কী করে আপনি খুলে যায় রাজ ভান্ডারের দোর-অক্লেশে সেঁধিয়ে যায় চোর ! পাল্টা মন্তর ঝাড়ে যদি বুড়ী-বাহির থেকে কপাট পড়ে যায়, অঘোর নিদ্রায় সবাই পড়ে-ঢুলি – চোর পালিয়ে যায় বহে চোরাই মালের ঝুড়ি-ভয়ানক বুড়ী সে থুত্থুড়ি । চার চোর তারে দাঁড়ালো ঘিরে, বুড়ী পাকালো সলতে মড়ার চুল চিরে । মড়ার মুঠাতে ধরিয়ে দিলে সেটা-ফুঁক- মন্তর একটা পড়লো বুড়ী ধীরে ধীরে –

' 'খোল খোল আগল কুলুপ কুঞ্জি
খোল নী:সাড়ায় ,এই দুই তিন গুনতি ।
জ্বলছে পিদুম মড়ার হাতে
আলো পড়ুক ধনের ঘড়াতে

তিন দুই এক গুনতি ।
কাক পেঁচা থামাক চেঁচামেচি,ঘড়ি থেমে যাক ।
উল্টাক পাল্টাক চার কড়া কড়ি ঘেঁচি
চোর পালাক তো বুদ্ধি বাড়াক ।
কুবের ভান্ডারে বেজি এদিকওদিক ফিরে
বসে থাক দুই তিন এক,এক দুই ফাঁক গুনতি !”

মন্তর পড়া মড়ার মুঠার চাপে দুপুর রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়ে আছে দুপুলিয়ার লোক । বাঘের ঘরে ঘুমায় বাঘ-দুপুরিয়া ডাকাত দুপুলিয়ায় ঢোকে- বাঘের ঘরে যেমন যোগ ! মড়ার হাতে চেরাগ প্রদীপ, পগার পারে করল ঝিকমিক-যেন আঁধার কোটার বাহিরে একটা জ্বলছে নিভছে জোনাক পোক । মড়ার হাতের উল্টো মন্তরে অবাধে চোর যায় চলে- শব্দ হয় না,পা পিছলায় না, দোর আলগায় না আগড় কুলুপ, অন্ধকারে প্রকাশ পায় সুনসান রাজবাড়িটায় যা আছে যথায়-চোর জেনে যায় অলিগলির সন্ধান সুলুক । নি:শব্দে খোলে খিড়কি দরজা- যেন এল পালিসে সাফ মির্চি-ধরা কল কবজা । অলিগলি চোর যায় চলি-মড়ার মুঠায় চুলের সলি-আলো ফেলায় সবজা ! পড়ে চার চোরের পা উল্টো মন্তরে তিন দুই এক, দুই এক তিন করে, যায় ধাপে ধাপে সিঁড়ি চড়ে । কারো দেখা নাই,ঘুমায় অঘোরে শাস্ত্রি-সেফাই –সং যেন রেখেছে কেউ মাটিতে গড়ে । শ্বেত পাথরের কাটা,জালি দিয়ে ঘেরা ঘুমায় আসান পাষান । সান-নদী পারে দুপুলিয়ার জানালা মহলটা- কাচমহল,নাচমহল,খাসমহল-মহলের পর মহল, কোথাও নাই পাহারা টহল-ঘড়িয়াল ঘুমায় পড়ি,রাত কত ঘড়ি খোঁজ নাই সেটা । বুড়ী দিয়েছে উল্টো মন্তর পড়ি দু-কুড়ি নয় বার । সময় পায়নি কুলুপ লাগাতে খাজনা খানার খাস মোহরার-ঘুমের তাড়াতে বাসাতে শুয়ে আছে বেহুঁশিয়ার ! জীবন্ত যা কিছু দেখে ঘুমেতে কাতর,চার চোরে পাতল চক্কর,খাজনা ঘরের কাছ বরাবর । গ্রহনের চাঁদ ধরেছে যেন সোনার ডাবরের ছাঁদ,আঁধার কোটার আলিসার পর ।

‘খোল খোল আগল কুলুপ কুঞ্জি’
খোল যা আছে বন্ধ-
পেয়ে মড়ার হাতার চুল-পোড়া গন্ধ ।
পোহাতে না পোহাতে রাত
খোল খাজনা খানার বন্ধ কপাট
ফাঁসিতে লটকা মরা-মানুষের হাত ।
চল ছুরি ছোরা,শাবল,হাতুড়ি,সিন্ধুক তোড়া ,
ধনের ঘড়া,টাকার তোড়া হাতাক চোর রাত ঘোরা !
তার পরে ওঠে তো উঠুক চন্দ্র-
তার আগে যদি কেউ ওঠে
মড়ার হাতের মুঠায় থাক খাঁড়ার
চোটে হয়ে কবন্ধ ।’

বন্ধ দোর সহজে খুললো,চার চোর ঢুকলো পায়ে-পায়ে চলি । জ্বলে উঠলো মড়ার মুঠাতে মন্তর পড়া মড়ার চুলের সলি । সোনা রুপার ঝলক-,চার চোরের চোখে লাগাল চমক । চৌকাঠ মাড়াতে চোরে সাক্ষাতে খুলে গেল খাজনার সিন্দুক-শব্দ দিলে দ্রুত বন্দুক ! কোথা ছিল কলের মুরুগ ব্যাঙ্গ দিল-চোর পড়া হু রে বরকন্দাজ অনাচার !কলের মন্তরে খাজনা

ঘরে দোর পড়ে গেল- উল্টা পাল্টা মন্তরে হাতুড়ি শাবলে কল-ঘরের কল-কবজা পথ দিলে না চোর পালাতে আজ। কলের মোরগের চিৎকারে ভৈরব দেয়ান জাগল যখন যা হল তখন বলে আর কি কাজ ।

দাদাশ্বশুরের ঘড়ি

গোবিন্দ ঘোষের আদরের নাতনী,দুপুলিয়ার খাস খামারের গোয়ালিনীর তিনি,মেজাজ কিছু শৌখিনী । তিনি লোকটি ছিল ভাল,সইতে পারতো কথা তিক্ত,অতিরিক্ত মেজাজ খোস ঐ ছিল তাঁর দোষ । গোয়ালিনী করলে রোষ,দুপুলিয়ার দেলখোস বাগের হওয়ায় দোষ দিয়ে খালাস হতেন গোয়ালিনীর তিনি । চাকরান বড় ছামের শেষে,গোয়াল-পাড়া ঘেঁষে,গোবিন্দ গোয়ালার বহুকালের পাকা-ভিটে,তারি অধিকারিনী গোয়ালিনী-সব ভালো তার,মেজাজ শুধু খিটখিটে । বিয়ের আগে ধরা পড়েনি এইটুকু জেনে ম্রিয়মান হন যখনি গোয়ালিনীর তিনি- ভালো পান,ভালো বিঁড়ি,শেষে ভালো তাড়ি হতে তাড়াতাড়ি মারামারি হট্টগোলের দলে ভিড়ে খোস মেজাজে অনেক রাতে বাড়ি-মুখো হন কোনমতে পথ চিনি,এমন ঘটে প্রায় প্রতিদিনই । গোয়ালিনী বলে,ঘড়ি দেখ,বেজেছে কয়টা ! গোয়ালিনীর তিনি বলেন, দাদাশ্বশুরের আমলের পুরোনো ঘড়ি,ওর কি চোখ আছে না কান আছে ? বাজাতে দে কানের কাছে- বাজাতে চায় যে কয়টা । খিদে লেগেছে,দে লুচি ভেজে,মেখে ঘি ময়দা । কথায় কথায় লাগে বচসা দু জনাতে । রাতে রাতে বচসাতে রাত প্রায়ই হয় ফরসা । ভঁয়সা বাথানে শব্দ দেয় মহিষ কয়টা । ঘড়িও বাজায় ভোর ছয়টা । গোয়ালিনী বলে,যাই দুধ পৌঁছাই রাজবাড়ি । গোয়ালিনীর তিনি বলে,তা যাও,কিন্তু আসতে চাও তাড়াতাড়ি- জোলাপাড়ায় ওরা বুনেছে যা খাসা শাড়ি,এক জোড়া গুলবাহারি-হাতছাড়া হয়ে না যায় । গোটা কয় টাকা বার কর,বায়না দিয়ে আসি তাড়াতাড়ি । গোয়ালিনী বলে,গুলবাহারি আনতে বলি না । আপনারি দেহটাকে রাত নয়টাতে ফিরে আনতে চাও বাড়ি,না হলে আজ আমারি একদিন কি তোমারি একদিন । ওগো দেখো,দেখো রইবে রইবে কথা,তোমারে বোঝাতে হারি । তিন দিন ঠিক কথা রইল, দাদাশ্বশুরের ঘড়ি কাঁটায়-কাঁটায় নটাই কইলো । তারপরে শনিবারে সকাল নয়টাতে ঘড়িয়াল দম ফেরাতে এল সাবেক কালের দাঁড়ানো ঘড়িটার গোয়ালপাড়ায় । সেই দিন থেকে শুরু হল কথার ফের-ফার । গোয়ালিনীর ঠাকুরদাদার ঘড়ি আর থেমে থাকে না কাঁটায় কাঁটায় রাত নয়টাতে । ফিরে ফিরে রোজ সেই বুলি-চেয়ে দেখতো,চোখ খুলি ঘড়িতে কত রাত? জ্ঞান আছে তো কোনটা কোন হাত ? গোবিন্দ ঘোষের নাতজামাই দেখে বড় কাঁটাটা বারোটাকে ছাড়ায় নাই;ছোট কাঁটাটা বেঁকে চুরে তিনটের ঘরে ভুল করে ঢুকেছে । নাতজামাই বলে,ও গোবিন্দের নাতনী,ঘড়িটার ভীমরতি ধরেছে,নিশ্চয় ছোট কাঁটাটাকে পেত্নীতে পেয়েছে । কালই ওঝা ডেকে ঘড়িটাকে ঝাড়ানো চাই । তাতেও না সারলে ওটাকে কালকে উচিত বউ বাজারে বেচে ফেলাই – ঘড়িটা ঘোড়া হয়ে গেছে দেখতে পাই । কী ! এতবড় কথা !গোবিন্দ ঘোষের ঘড়ি ঘোড়া হয়ে গেছে –তারপরে পেত্নী চেপে আছে ! দেখবে কারে বলে ওঝার ঝাঁটা । তোল তো আর একবার বেচবার কথা দেখবে ছোট কাঁটা ধরে কোন গাছে ! আরে তুলতেই হয় যদি,ঘাড়ে তুলে চুলোর জ্বালে পুড়ায়ে আসব ঘর-কুঁদুলে ঘড়ির ঘাড় ভেঙে । হনুমান থাম ভেঙে হরেছিল মৃত্যুবান-এর আর কী কথা আছে । আমারে দেখালি মৃত্যুবান- ভালো,কাল থেকে দেখি কে সাজে তোর পান । কে ভাজে গরম লুচি । গুম হয়ে রইলো গোয়ালিনীর তিনি মুখ বুজি । শুয়ে পড়লো ঘড়ির কাছটাতে গোয়ালিনী মুখ গুঁজি । সত্যিই সেদিন ছুটলো মৃত্যুবান-আর উঠলো না রাজার গোয়ালিনী নিত্য দুধের দিতে যোগান,সাজতে তেনার মিঠেপান ।আজকাল সে মানুষ আর নেই,গোবিন্দ গোয়ালার

নাতজামাই । হয়ে গেছে ঠিক –বেঠিক ছিল মাথা যেটুক ।ঘড়ি ঠিক সময়ে করে টিকটিক,ভোর পাঁচটায় তাড়া লাগায় নিয়মিত-রাজবাড়িতে পৌঁছে দাও গা খাঁটি দুধ । নয়তো দেউড়ির দেয়ালে লোহার গজালে আছে ভৈরব দেয়ানের শংকর মাছের চাবুক । হয় না যেন সময়ের এদিক ওদিক । রাত নয়টার ভয়টা গিয়ে ঠেকেছে ভোর পাঁচটায় । আচমকা চমকান ঘোষের পো-ভাবেন,হায়,হায়,কোথায় রইলো আমার প্রীতিপদের চাঁদ শ্রাবণ মাসটায় হল অস্তমিত । ঘোষের পো এখন চলেছে ঘড়ির বশে-ওঠ বললে ওঠে,বোস বললে বসে,খা বললে খাওয়া চোকায়,শো বললে শোয়া হয় খাটিয়াতে আলসে । ঘোষের পো- তে ঘোষালের পো-তে মাঝে মাঝে ঘড়িটা নিয়ে কথা হয় । ঘোষালের পো বলে ঘড়িটাতে তাহলে তোমার ভুতপুর্বার আত্নাপুরুষ ঢুকেছে নিশ্চয়-ওটারে আর ঘরে নয় । ঘোষের পো বলে,ইস্তির পুরুষ আত্না,এটা কি কথা একটা-থাক ঘড়ি বেচার কথাবার্তা । ও সেই থাক ঘড়ির ভিতর-বিক্রয়ের নামও ওর সামনে আর কথা নয় । তাঁতির পো,হাজরা পাড়ায় তার বাড়ি,বুনে আনলে শাড়ি গুলবাহারি,শুনলে এসে অশুভ খবর শাড়ি যে পরবে সে-ই নাই । বললে,তবে ফিরে যাই । ঘোষের পো বললে,তা কি হয় ভাই ? বায়নার শাড়ি নেওয়াই চাই,রেখে যাও ঐ ঘড়িটার পর । তাঁতির মুখে শুনলে ঘোষজা,এ শাড়ির যোগ্য আছে একটি কন্যা,রুপেগুনে ধন্যা,হাজরা পাড়ার দিলু পাচ্ছে না তার যোগ্য বর-সেই মেয়ে এলে পূর্ণ হয় গোবিন্দ গোয়ালার শূণ্য ঘর,বংশটা ও থাকে বজায় । ঘোষজা বললে,সে আমার অজানা নেই । তাঁতি বললে,মেয়েটা নয় ফেলনা,বলে গেলাম যা ভেবে দেখো,সুখে করবে ঘর-কন্না । হাটে এমো-কাঠের জানলা কিনতে এখন আমি যাই । তাঁতি গেল জানলা কিনতে,তখন ঘড়ি বললে,বেলা তিনটে,ঘোষজা বসে করে চিন্তে-গাই কিনতে গো-হাটে যাই,না দিনটা দেখে হাজরা পাড়ার মাঠ বাগে আগাই । ডাকের মন্তর,কাক চরিত্তর দেখে ঘোষের পোর যাত্রা করতে স্থির,বড় কাঁটা দাদাশ্বশুরের ঘড়ির ঘুরলো আড়াই পাক,ছোট কাঁটাকে দু-ঘর ঠেলে দিয়ে টিকটিক করলো যেন হয়ে আস্থির ।সে দিকে দৃষ্টি না দিয়েই,লাল সুতো হাতে বেঁধে একখেই,খসখসের আতর বেশ করে মেখে,ফস করে চাবি দিয়ে দোরে,দিলু হাজরার জামাই হতে মানস করে,পা চালিয়ে সজোরে ঘোষজা হল বাহির । সামলাতে পারলে না-তাড়ির দোকানে খোঁজ করতে বসে গেল একখানা গরুর গাড়ির । দলে ভিড়ে গান ধরলে-

‘ ‘গরু গাড়ি চাকায় চলে
গাছের আগায় তাল ধরে
সে গাছে আছে তাড়ি ।
টাল মাটাল করবি কত
কাল রে মন ভারি
না হলে চলো না শ্বশুর-বাড়ি ।
সুয্যি ডুবলো;চন্দর ডুবলো,
শেয়ালে তুললো রোল ।
বোল হরিবোল;ভাঁড়ের তলা শুকনো খালি ।
ওরে গরু বুদ্ধি সরু তোর
নিত্যি কাট জাবোর
আমি চলি ঝট শ্বশুর-বাড়ি,আছে পা-গাড়ি ।’’

আকাশে তখন দোয়াদশীর চাঁদ আলো দিচ্ছে চনচন-পাঁচকোশি মাঠ ভেঙে ঘোষের পো চলছে বেগে,হাজরা-পাড়া তেগে ষাঁড় ছুটেছে যেন হনহন । থেকে থেকে দেখছে ঘাড়তুলি-এই লাগছে গো ধুলি ঠিক আর একটা পাকা দেখার দিনের মতন,কাছেই দেখছে যেন হাজরা পাড়ার সাঁজের পিদুম,তুলসী তলায় মাথার উপর চাঁদটা যখন । নিশুত রাত,মাঠের শেষ না পাই,ভুত পেরেতের ভয় নেই,চলছে তো চলছে একলাই গোবিন্দ ঘোষের আধা বয়সী নাত-জামাই । ভাবেতে তন্মন –ভাবছে ঠিক চলছে পথ চিনি একাই ! এমন সময় টিং টিং টিং ওকি শুনতে পাই-যেন দাদা শ্বশুরের ঘড়ি বাজলো টং টং ! ঘোষের পোর মুখ বিবর্ণ,ঘাড়ের সাথে ফিরলো কর্ণ, গো- ধুলির গোলাপী বর্ণ, কোথাও তার চিহ্নও আর নাই । গা-হাত-পা ঝিন ঝিন,মন বললো,এটা রাত না দিন ? পিছনে শব্দ পায় টুপ টাপ ঘুট-ঘাট —যেন কাঠের খরম পায়ে হাঁটছে কেউ ভেঙে মাঠ;নিয়ে তারি পাছ । আর কোথা আছে ! ঘোষের পোর ঘামে ভিজলো আতর মাথা মেরজাই ফিনফিন । কে- রে! বলে দৌড় তো দৌড়,দড়া-ছেঁড়া গরুর দৌড় ! টুক-টাক ঘুট-ঘাট ছুটছে যেন গরুর পাছে গামলাটায় দিতে জাব । তেপান্তর মাঠ জুড়ে শব্দ ! ভুতের চক্করে ঘুরে ঘোষজার শৌখিন প্রাণ হয়রান হল যা এমন হয়নি কোনদিন । তাতারস ছিল ঘোষের পোর ধাতে যথেষ্ট জমা । তাই ছুট দিতে সে ডাইনে-বাঁয়ে হেললো বটে,এললো না ।লাফিয়ে হলো পগার পার,মাড়িয়ে চললো ঝোপ-ঝাড় ।পিছন বাগে তার খড়ম পায়ের খট-খট চলার শব্দের তথাপি নেই ক্ষমা । কোথা থেকে আসে শব্দটা,মাটি থেকে,না আকাশ থেকে,না আশপাশ থেকে কে বা দিচ্ছে,কীসের বা শব্দ ওটা! না গাড়ি চলার,না গরু চলার,না ঘোড়া ছোটার,ভাঁটা গড়াবার,নামও নাই থামবার । শব্দটার কিনারা করে কে মাঠের মধ্যে,এ রাতেতে সাধ্য আছে কার ? ভুতের আড়ায় বহুদুর ছুটে জেরবার,চকিতে ফিরে দেখলো একবার ! পা চলল না আর ঘোষের পো দাঁড়িয়ে গেল থ । মুখে নাই রা-এ যে পা পেয়ে দৌড়েছে দাদাশ্বশুরের দাঁড়া ঘড়িটা বিদঘুটে । সেই সময় চাঁদের আলো বারালো মেঘ ফুটে । দাদাশ্বশুরের ঘড়ি দেখালে গোলাকার মুখটার ডৌল । চাঁদমুখটি যেন তার খিটখিটে বৌ-র । গুলবাহারি শাড়ির ঘোমটা- দুটো কালো চোখ পুট-পুটে ! বস আর দেখা নয়-ঘোষের তনয় দে দৌড় যারে কয় নিজ বাড়ির মুখে ঘরে ঢুকে কি শুনেছে টিং টিং টিং টিং টিং-দাদা-শ্বশুরের ঘড়ি বলছে-হয় হয় দিন-বাজছে পাঁচটা,চেয়ে দেখ দেখিন-গোলে যাও-টিং টিং টিং । ভৈরব দেয়ান খায় প্রতিদিন দেয়ান খায় প্রতিদিন হিঞ্চের রস এক কাঁচ্চা কাঁচা দুধে,জানতো সক্কালে উঠে !!

পুঁটেরানীরমঠ দুপুলিয়ার পুঁটেরানী দাহ হলেন যে আঘাটায়,সেখানে উঠলো কালীবাড়ি ।পুজারী হলেন ঘোর শাক্ত ঘাট-বামন শ্যামাচরণ নাম । ইস্টেটের বরাদ্দ মাসিক পাঁচ টাকা-শ্যামাচরণ সংসারে একা,তাতেই ইষ্টদেবতার ভোগরাগাদি সামলে চালান । সেদিন ভৈরব দেয়ান শ্যামাচরনকে ডেকে সমঝান-মায়ের সেবা তো যথাসাধ্য করছো,মঠ-বাড়ির সৈষ্ঠব বাড়ছে কই?শুনি তো কেবল বসে বসে পড়ছো তন্ত্রের বই,মঠবাড়ি যে সুনসান, অথচ বাড়াতে বলছো মাসিক বারদ্দ । শ্যামাচরণ বলেন,আজ্ঞে আমি তো আছি চিরবাধ্য । দেব-সেবার ত্রুটি হয় না, অতিথি জমা হয়-যদি রয় মদ্য-মাংস,নবান্ন,উত্তম ঘৃত,মিষ্টান্নাদি সুখাদ্য । বলেন ভৈরব দেয়ান,অতি সিয়ান- ও কথা দাও ছাড়ান,আমি ভাবছি এক,তুমি ভাবছো আর ! আমি চাচ্ছি মঠ বাড়ির সৈষ্ঠব, তুমি চাচ্ছো কাগ-চিল অতিথ সব ইস্টেটের অন্নধ্বংস করুগ গবাগব । তোমার মত বেকুব দেখি নাই এমন,তোমারে বোঝায় কার সাধ্য । শ্যামাচরণ বলেন,উপদেশ কন,পালন করতে প্রস্তুত এ দাস চিরবাধ্য । উপদেশ

হল,এই আদ্যনাথকে কর তোমার চেলা । তুমি তো কবে আছ কবে নেই । তোমার অবর্তমানে যাতে সকল কাজের ধরতে পারে খেই,বর্তমানে পুজো-আস্রাদির কাজে বালকটাকে পাকা-পোক্ত করে তোল এই বেলা । যাও,বারে বারে দরখাস্ত করে ব্রক্ত করো না আমায় । বিনা বাক্য ব্যয়ে উপদেশ লয়ে বিদায় হয়ে গেলেন শ্যামাচরণ চিরবাদ্য । মঠের কাজে ভর্তি করলেন আদ্যনাথে দেয়ান,তার মা ছিল তাঁর বেয়ান । আদ্যনাথের মাছের মতো নিপলক গোল দুটো চক্ষু, বালকটা যেন একটা তরক্ষু,বুদ্ধি সুক্ষু,অথচ দেখে মনে হয় একেবারেই নয় সেয়ান । শ্যামাচরনের সাথে ঘটি গামছা হাতে কোমরে জড়িয়ে পৈতা খান । অটব্য অরণ্য এঁদো-পুকুর,ভাঙা ঘাট, তিনি ফুকুরে দালানে মুক্ত-কেশী দেবীর পাট,তারি উত্তরে সাধন কুটিরে স্থান পেলেন শ্যামাচরণের চেলা বাবা আদ্যনাথ ! শুরুর কাছে নিয়ে দীক্ষামন্ত্র,শিক্ষা করেন চেলা নানা তন্ত্র পূজাপাঠ । কারন করা তান্ত্রিক মতে,পাঁঠার মুড়োটা আসটা করে চাট । পরিপক্ক হতে দেরী করলে না মঠাধ্যক্ষের কাজে ভটচায় শ্যামাচরনের চেলা আদ্যনাথ । ইতিমধ্যে এক রাতে,মঠের সৈষ্ঠব হয় যাতে,চেলার সাথে যুক্তি করেন চিরবাধ্য শ্যামাচরণ । করে দেখলে হয় না কুবরী মন্ত্রে কুবের সাধন ? আদ্যনাথ গুরুরে কন । গুরু বললেন,কথাটা ঠিক, কিন্তু নকুল কুলার্ণবে লিখছে শক্তি বিনা এ সাধনের ফল অনিশ্চিত । আদ্যনাথ বললেন,বুদ্ধি শক্তি তো আছে- অন্য শক্তির কিং প্রয়োজন । তিন আঙুলে নকুলেশ্বর মুদ্রা দেখিয়ে জানিয়ে দিলেন চেলাকে শ্যামাচরণ ক্লিং মন্তর জপের কালে সোনার একটি সজীব প্রমান নেউলের আছে প্রয়োজন-সেটা মেলাই শক্ত বাপধন । আদ্যনাথের নিপলক ভাঁটা চোখে জেগে-জেগে পড়লো সেই প্রথম সেই দিন রাত তিনটাতে । বেজীব আওয়াজে ঘুম ভেঙে দেখে পুকুর ঘাটে পড়ে আছেন সর্ব অঙ্গ হিম,তিন আঙুলে নকুল মুদ্রা- ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চিরবাধ্য মুক্তকেশীর মঠাধ্যক্ষ শ্যামাচরণ । বেয়ানের মুখে ভৈরব দেয়ান শুনলেন শ্যামাচরনের হয়েছে তিরোভাব ! গোঁফ মুচড়ে দেয়ান বললেন,যাক চুকলো উৎপাত । এখন যা করেন আদ্যনাথ- বলেই দেয়ান নস্য নিলেন একটিপ । তদারকে গেলেন পেশকার-দেবতার সম্পত্তি যেখানকার যা রেখে গেছেন কিনা ভুতপুর্ব শ্যামাচরণ । পেশকার দেখে এলেন সব আছে কেবল নাই পূজারীর সেরাচীন বাঘাসন । কুন্তি বুড়ি নিযুক্ত হল সেই দিন থেকে মঠ বাড়ির খোন্তা খুন্তি ইত্যাদি করতে মার্জন । আশ্বিন গেল,পড়তে কার্তিক ঝাঁজ শেওলা সিঁদুর গোলা যেন দেখাচ্ছে ঠিক । ঘাটে বসে কুন্তি বুড়ি পিতলের খুন্তি হাতা কসে মাজছে,ঘসে ঝামা ইঁট । হেন কালে ঘাটের রানা হতে কুড়ি হাত অন্তরে পড়লো বুড়ির নজরে,ভুস করে উঠলো,ঝুপ করে ডুবলো,মা বলে দিয়ে ডাক,ড্যাব-ড্যাবে চোখ বোয়াল মাছ । এমনি একবার নয় তিনবার ! ঠেলে শেওলা ঝাঁক,মা গো মা, বলে দিয়ে আবাজ মাছ উঠলো আর ডুবলো আকাশে তুলে লেজের দিক । পুকুর ঘাটের খবর যেমন হয়ে থাকে বরাবর হওয়াতে পৌঁছাল বাজারে হাটে । পাটরানী শুনলেন কুন্তির মার কাছে । রাজা শুনলেন রানীর মারফতে-পুঁটেরানীর পুকুরে পুঁটিমাছ মা মা বলে শ্যামা বিষয় গাইচে বসে ঘাটে । পেশকার বললেন,দেওয়ানজী, শুনছেন কি ব্যাপার ? রানীর পুকুরে জলহস্তী একটা শ্যামা সঙ্গীত শোনাতে আদেশ পেয়ে গেছে শ্যামা মার । হুম,বলে গোঁফ মোচড়ালেন ভৈরব দেয়ান দু-চারবার,জবাব দিলেন না কোন প্রকার । পাটরানীর হুকুম হল যখন ভাঙাঘাট সারিয়ে শ্বেত পাথর লাগাতে,দেয়ান বুঝলেন আদ্যনাথ মঠবাড়ির সৈষ্ঠবের কাজ নিয়েছেন হাতে । কুন্তির মা শুধায় আদ্যনাথকে,হ্যাঁ বাবা, কুন্তি তো কানে কালা,কেমন করে শুনলে,মা বলছে মাছে? আদ্যনাথ বলেন,কি না হয় মায়ের কৃপাতে,মাছে কয় কথা,শুনতে পায় কালাতে । যা হোক ঐ সব দৈব বলতে

মানা যার তার কাছে,বুঝেছ কুন্তির মা । কুন্তির মা বলে,কুন্তি আমার অত শত বোঝে না ।আদ্যনাথ বলেন,তা বললে কি চলে ? শ্রীমন্তের বাপের মশাল হয়েছিল সিংহলে কমলে-কামিনী দেখার কথা বলে- সেটা জানা আছে । কুন্তি যে কালা সে কালাই রইলো । কুন্তির মার কাছে হিমী,বামী শৈল শুনলে কমলে-কামিনী পুকুরের মাঝে উঠেছে আর গিলেছে জলহস্তী । রাষ্ট্র হল কথাটা বাজার বস্তি-লোকের আনাগোনায় হাঁটাপথ মঠের দিকে অল্পদিনে । প্রস্তত হল তিন বিতস্তি । ইতিমধ্যে খুন্তির মেলা বসাতে দেয়ানের বাসাতে পাঁজি হাতে আদ্যনাথের উদয় । দেয়ান কইলেন,আর দেরী নয়,আগামী ভুত-চতুর্দশী উপযুক্ত সময় । তেল পিদুম ইত্যাদির খরচা সিষ্ঠবের কারণ ছেংছন করলেন স্বয়ং ভৈরব দেয়ান মহাশয় ।

দেয়ানের চটি

ভেড়ির চরে দুপুলিয়ার পুরোনো গড়ে ভেঙে-পড়া খোয়াব-গা সেখানে বাস করে রাজার মুচি,সেলাই করে বিবিরানীর কিংখাবেব পা-পুস আর সোনার তারের ফোঁড় দিয়ে হরিনের চামে রাজার লপেটা । এমাসটায় দেওয়ানজীর হয়েছে ফরমাশ খটাশের চামে খালাষি-চটি-সেটি হলেই বেড়ে যায় ভাতা । মুচির শ্বশুর চামার,তারে শুধাতে দর চামড়ার,চামার-গুষ্টি রুখে উঠলো করে মার মার । বলে,দূর দূর কোথাকার মুচি তুই,চামারে করে না ও চামের করবার; জামাই বলে পেয়ে গেলি পার । শাশুরী বললে,বাছা,খট্টাঙ্গ রাজার ঘোড়া-নাম কোরো না চাম ছাড়বার,মেয়ে মরে যাবে আমার । মুচির ঘেসেড়া-পিসি ঘোড়ার ঘাস কাটে ভেড়ি-চরার মাঠে,তাকে শুধালে খটাশের কথা মুচি । সে বললে,শুনেছি যা চলে খটাস খটাস তাকেই বলে খটাশ । চামার শ্বশুরের কাছে ঘোড়ার চাম কেনো গো দরদাম বুঝি । সব ঘোড়াই খটাঙ্গ রাজার বুঝে শ্বশুরবাড়ির নামে ভড়কালো মুচির পো । খাটুলিতে শুয়ে ভাবছে খালাষি-চটির কথা;নিশুত হল খোয়াব-গা,মেঘেতে মিলালো চাঁদের ছটা । রাত নিশুতি,শুনলে মুচি শব্দ খটাখট সুস্পষ্ট । বুকের মধ্যে করলে অনুভব নী;শ্বাসের কষ্ট । তারপরেই চোখ চেয়ে খাটের খুরোর মত অষ্ট আশি বছরের দেড়ে এক বুড়োকে আঙুল নেড়ে ডাকতে দেখলে পষ্ট । গায়ে তার পাতলা চাদর-যেন এই ছেড়ে উঠেছে পাতাল হতে ঠেলে মাটি আর কাঁকর । মাথা-ভর ধুলো মাখা জটা । মেঘ কেটে তখন প্রকাশ পেয়েছে চাঁদের ঘটা । বন্ধ ঘর ছেড়ে বার হল মুচি,বুড়োর ইঙ্গিত বুঝি,চামকাটা বাটালিখান কোমরে গুঁজি । লণ্ঠনটা নেবার পেল না সময়,ঘাম দিচ্ছে গা-ময় । বুড়ো উঠে চললো খোয়াব-গা'র চাল-চুলো পড়া পাঁচতালা চিলে কোঠার দিকে,চলে এসো জানায়ে ইঙ্গিতে । মুচি চললো, কলের পুতুল যেন উঠি,পড়লো কিনা পড়লো তার পা ধাপ ধ্বসা টালি ভাঙা ঘুরোনো সিঁড়িতে-চাঁদনীতে তখন মিট মিট পিদুমের অধিক আলো নয় । পেঁচা না করে চেঁচামেচি ঘেঁচি-কড়ির মতো একটা চোখ মটকালে বসে পাঁচতলার ফাটা দেয়ালে । মুচির মনে হলো,আনলে হত ভালো একটা লণ্ঠন,সিঁড়ি ভেঙে কোমরটাও করছে টনটন,বুড়া ঠিক চলছে তখনো এগিয়ে হনহন । পেরিয়ে ছাতের পর ছাত,ওঠাল নামাল সিঁড়ির ধাপ,অলিগলি,ভাঙা দোর ঘুলঘুলি,ঢুকেই একটা গোল ঘরে হওয়ার পরে ধূমার মতো পাক খেয়ে ফিরে দাঁড়াল বুড়ো । মুচি দেখলে সামনে পড়ে খটাশে চাম ঘরখান জুড়ে যেন সতরঞ্চ একখান । ইঙ্গিতে বুড়ো জানান দিলে,কাটো চাম রাতারাতি ! বাটালি চালাতে বসে গেল মুচি কসে মুঠিয়ে ধরে কাঠের ডাঁটি । চামের পরে চোপ বসাতেই,ওপ বলে যেন তোপে উড়ে গেল বুড়ো ঝুলের মতো । যেন মাকড়সার জালে আটকানো রইল তার কাপড়-চোপড়গুলো । ঠিক সেই কালে কানাচের আড়ালে খুন-খুন বলছে,কানে শুনলো মুচি-চক্ষু বুজি লেপ মুড়ি দিয়ে শুলো । সকালে পোষা নুলো বেড়াল মেঁও মেঁও শব্দে তারে জাগালে । মুচি উঠে দেখে নিজের যন্তর-পাতি রাখা চামের বড় থলিটাকে বাটালি চালিয়ে খালাষি-জুতোর আকারে কেটে রেখেছে খটাশের চামড়ার খোয়াবে খেয়ালে । ভাবে তখন রাজার মুচি খালাষি-চটির গোড়ালি বাঁধাবো কি গাধার নালে ।

ছিটওয়ালা কাক

ছিটওয়ালা রাজার পোষা দাঁড়কাক খানা-কামরার ঘুলঘুলিতে থাকে । রাজার গোয়াল রোজ এক গোলা মাখম,দু-গুলি পনির খাওয়ায় পরের চেকনাই বাড়ে যাতে । গুরুমশাই পড়ান রোজই তাকে ক'য়ে আকার কা খ'য়ে আকার খা । সে পড়ে ক কা কাক বক,বসে খানা-কামরার বারান্দায় । এর বেসী পড়ায় পারলে না আগাতে । কিন্তু স্বভাব-চতুর কাক,পড়ে বা কোনদিন,এমনি দেখায় ভাব সভাব সাক্ষাতে ! রাজার চিহ্নিত কাক ঠোকর বসালে টাকে,সভা-পন্ডিত হেসে কিঞ্চিৎ-একচক্ষুর্নকাকোয়ং- বলে উদ্ভট একটা কাক-প্রশস্তি চট শুনায়ে দেন রাজাকে । রাজা হন তুষ্ট,কাকও হন হৃদপুষ্ট । তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট-জেনে নিল সচতুর পন্ডিত দুপুর বেলা কৃষ্টনাম পড়াতে দুপুলিয়ার কাকে । কাক তো নয়, দুপুরিয়া ডাকাত-একথা বললে রানীর চাকরানী । পন্ডিতানী বলেন-ও কথা বলতে নেই । আমাদের তিনি বলেছেন,ও কাক নয়,এক-এক খগোমানী । মেথরানী যদি বলে-এক চোখোরে ঝাড়ু মার,ঝাড়দার বলে,কাকের ঠোকরে হলি বলে কানী । ওকথা তুলিসনে আর । ভৈরব দেয়ান একদিন বলেন,ওহে পেশকার,কাক চরিত্র অতি বিচিত্র-একখানা দেখো পেশকার বলেন,কাল থেকে চশমাখানা খুঁজে পাচ্ছি না আমার । এমনি প্রতিদিন কারো না কারো কিছু না কিছু হারায় । কুটোটি এদিক ওদিক হতো না যে দুপুলিয়ায় সেখানে রোজই হারায় এটা-ওটা । গালা-মোহর করতে মুহুরী পায় না বাতির টোটা ! বলে,এই ছিল মশায়,এই নেই ! দপ্তরী দেখে,খুরি-সুদ্ধ উধাও লেই । দেয়ানজীর ধমকের চোটে চাকর-নফর কারো মনে সুখ নেই । বাটি-চালা ডাকে,ঘটি-চালা ডাকে,পয়সা চলে,কড়ি চলে ধরতে চোরটাকে । চাল-পড়া খেয়ে শুধু নিজেদেরই গলা শুকোয়,জিভ হয় মোটা । সেই সময় কাছারি বাড়ি ফাটালে চিৎকারে রামদুলুলী-চানের বেলায় চুরি গেছে তার হাঁপানির মাদুলি ! দপ্তরীর দুর্বুদ্ধি হল,বললে-কেন চেঁচাস,শিষের মাদুলি গেছে যাক-গলায় বেঁধে রাখ একটা কালী-ছোপা চুনের পুঁটুলি । এই না,হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে আঙিনাতে শাপ-শাপন্তি সুরু করলে রামদুলুলী-

''মরুক মরুক কেকো মরুক
মাথার কেশ উকুনে কুরুক
ঘুমিয়ে জেগে ঘুরুক মাথা
বুকে ঠেলা দিক আগুনি ভাঁটা
বল কে খেলি জনায়ের মাদুলি
বার কর হেঁচে-হেঁচে হিক্কে তুলি ।
নয়তো মর হেসে হেসে,খেতে খেতে
শুতে শুতে,বসতে,হাঁটতে,দাঁড়াতে উঠে ।
মরুক না মরুক,হাঁপ তো ধরুক !
আমার মাদুলি বন্দুকের গুলি
গুলগুলি হয়ে গলায় ফুটুক- ''

কারকুন বলে,রামদুলুলী হও শান্ত । রাজবাড়ির মধ্যে শাপ-শাপন্তি কর কেন ? আর কেন?
লাঠি ঠুকে উঠলো যেন নেচে ডাইনী বুড়ী রামদুলারী –চললো ছড়া কেটে-
'জনায়ের গোঁসায়ের মন্তর

কই কাটাক দেখি পারে কোন চোর !
চোর বলে চোর,মাদুলি চোর,
মাদুলি বলে মাদুলি-
হাঁপের মাদুলি-মন্তর মন্তর ।
খুললো খুললো বলে যমের দোর
লাগলো লাগলো বলে দোক্তার ঘোর
তুললো তুললো বলে অসুধ
এলো এলো বলে যমের দূত!''

হেনকালে ঘটলো কান্ড অবাক-যমদূত না এলো, এলো একটা ঝড়ো ডোম কাক !কে বলবে সেটারে দেখে ছিতয়ালা দুপুলিয়ার রাজার পোষ্য !সে কাশলে,কেশোরুগী যেন নিয়েছে লস্য-খাক খাক খাৎ! গলা চিরে তামার মাদুলিটা মাটিতে পড়লো খটাৎ । রাজার বড় খানসামা বলে উঠলো-আপদের শান্তি যাক । কাকটা করেছে কুখাদ্য হজম অনেকগুলি । শোধন করে করগা ধারণ মাদুলি,বুঝলে তো রামদুলুলী ।

গুমগুমি

বাজার দুপুলিয়ায় গুমগুমি এয়েছে-উঠলো রব ! ঘরে বাজারে ডরে মরে লোক,বলে ,কে এলোরে বাবা,বাঘের ঘরে ঘোগ-সেটা গোটা ধরে আর থলিতে ভরে,কপালে টেনে নিয়ে চুনের তেলোক । বাড়ি নিয়ে খেয়ে ফেলায় গব-গব । শখের দলের অধিকারী,-বেশ একটু ওজনে ভারী । সে দেনার দায়ে সরে পড়লো-গুমগুমিতে পেয়েছে বাজারে রটলো । প্রবোধ সুবোধ ভালো দুটো ছেলে,বিয়ে হতো আজ কি কাল গেলে-হঠাৎ নিলে সন্ন্যাস । বাজারে রটলো,গুমিতে ধরেছে,আর কি ব্যাস । বিন্দাবনে গেল দুপুলিয়ার কীর্তনিয়া,পাষান গলতো যার মাথুর শুনিয়া-বাজারে রটলো গুমিতে তারে গেল নিয়া । ফজলু সহিসের দুম্বাটা বকরিদের আগেই পালালো-গুমিতে নিয়েছে বাজারে রটলো । গো-বদ্যি সে বদ্যিনাথে গেল সুদখোরের তাড়ায়-গুমিতে নিয়েছে সত্যি সত্যি রটলো পাড়ায় । গুমির ভয়ে রাত না হতে,বন্ধ হয় দোকান-পাট,খোলা রয় না দোর-জানলা-কপাট সুনসান হাট বাট,কার কারবার,লোক চলাচল সব বন্ধ । দেয়ান বলেন,পেশকার ব্যাপার কি বুঝছো ? পেশকার বলেন বুঝছি পরিস্কার ? ব্যাপার টা নয় তুচ্ছ । দেয়ান বলেন,রটনার মধ্যে আছে সত্য মিথ্যা কতকটা উহ্য ? সেদিন পহর রাতে,লোকজন নাই হাটে,ভৈরব দেয়ান একা যান গুমগুমির তল্লাসে গুপ্তি হাতে । টাকের পরে কল্কাদার চামড়ার কাপু,কোমরবন্ধে কলম-কাটা চাকু,সর্বাঙ্গ ঢাকা কলন্দরি আলখাল্লাতে । দুপুলিয়ার কেল্লার বাইরে শ্মশান ঘাট,মাঠের মাঝে খাড়া আছে একটা মুড়ো খেজুর গাছ । শকুনি কটা চুনের পৌচড়া টেনেছে তাতে,জন মানবের নাই যাতায়াত সে তল্লাটে ! দেয়ান প্রথমে যান বাজার ঘুরে হেঁকে-মুশকিল আসান! সাড়া শব্দ নাই কারো,চকর বাজার সুনসান । পহরা কি প্রহরি,কারো দেখা নেই ও হরি গেরস্তো পাড়া,আছে নি:সাড়া গুমির ভয়ে বেরোবার নেই নাম । একাই আগান দোকান-পাট পারিয়ে মাঠের দিকে ভৈরব দেয়ান । আকাশে তখন নাই চাঁদ,খেজুর তলে এক মূর্তি দেখা দিল হঠাৎ-কালো মুস্কো- চটের থলির পাশে বসে আছে চুলগুলো উস্কো-খুস্কো যেন যমদূত সাক্ষাৎ । কে রে ! বলে দেয়ান ছাড়লেন এক কোতোয়ালী হাঁক । মূর্তিটা যেন কালো দত্যি,উঠে দাঁড়ালো রাতের আলোয় যেন দেখালো দুপুরিয়া ডাকাত বুক চটালো । ভৈরব দেয়ান, তিনি নন কম শক্তিমান-কচি ছেলে নন একরত্তি-মুঠিয়ে ধরেন গুপ্তি ভাবেন,দেখা যাক গুমি কিনা সত্যি ! মূর্তিটা চটের থলিটা তুলে ঘাড়ে,আগাতে চায় মাঠের পারে । কে রে যাস ! দেয়ান বলেন তারে । লোকটা যেন শুনেও শোনে না,চেহারাটা একেবারে অচেনা । দেয়ান বলেন,দেখছো বাপু কলন্দর আমি মাথায় কাপু – একা পড়েছি মাঠে, একটু দাঁড়াও, যাই একসাথে । মূর্তি বলে দাঁড়াবার সময় নেই । সুর্যোদয়ের আগে ভুতের বোঝা নামাতে হবেই । রোদের ভয়ে চলাচলি করি রাতে দামী মাল আছে আমার বোঝাতে । সোজা কইবোই,বই ভুতের বোঝা । উটের পিঠে যেন কুঁজের বোঝা । কথাটা কইতে সোজা,বোঝাটা বইতে সোজা নয় । এই বলে আর মূর্তি অগ্রসর হয় । দেয়ান ভাবেন,এই সেই গুমি নিশ্চয় গেছে বোঝা । আগে চলে চট থলি ঘাড়ে কালো মূর্তি । দেয়ান চলেন হটহট চালে হাতে ধরে গুপ্তি । খোয়ারের বাঁকে স্থানটা অন্ধকার,দেয়ান সেই ফাঁকে থলিতে বসান চাকু আপনার । মাটিতে প'লো থলি-ছিড়ে শির যেন গোটা পাঁচ ছয় । দেয়ান বলেন,এ কিরে ? লোকটা বললে,কি করলে মশায়? বৈতাল কুমড়ো কটা হল নয় ছয় । এ সব বস্তু রাজা রাজোড়ার রাজভোগ, যোগাড় করতে ভুগতে

হয় ভোগ ।গুমি বলে কত লোক মার দিয়েছে মশায় । আগাগোড়া বরবাদ করলে এখন কি হয় ? দেয়ান বলেন,বোঝা গেছে,যা গেছে তা গেছে,আমার কাছে যাদুবিদ্যা খাটবার নয় । দেখা যাবে সকালে কাল বৈতাল কুমড়ো কোন গাছে ফলায় । সরে পড়ো ভালো চাও তো-আমি ভৈরব দেয়ান সেটা জান তো ? ও কথা আর উচ্চবাচ্য নয় । দুপুলিয়ার রাজা হিঁদূর চুড়ো,বৈতাল কুমড়ো খাবার পাত্র নয় । বিদায় হও,নিয়ে টাকা পাঁচ ছয় । মুশকিল বাধবে সকালে কালকে কুষ্মাণ্ড যদি নরমুণ্ড হয় । ভুতের বোঝা বহে এলে এবার প্রাণ-সংশয় ! ঘাল হয়েছে গুম্গুমি-সকালে পেটান দুমদুমি দুপুলিয়াতে দেয়ানজী মশায় ।